بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১লা এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্বৃতি পড়ে শুনিয়েছিলাম যাতে তিনি বলেছেন, "তোমরা যারা আমার যুগে জন্মগ্রহণ করেছ আনন্দিত হও এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ কর যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এ যুগে সৃষ্টি করে সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা সেই যুগ মসীহ্র যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে যার অপেক্ষায় বহু প্রজন্ম এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।" সেই উদ্বৃতির সারমর্ম এটিই ছিল যা আমি নিজের ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আমরা আহমদীরা নিঃসন্দেহে সেসব সৌভাগ্যবান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে আর সেসব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলে। আমরা সেসব দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেনি। বরং কতেক এমন দুর্ভাগাও আছে যারা বিরোধিতায় সকল সীমা লঙ্ঘন করেছে আর এভাবে তারা খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং বিশৃঙ্খলার শিকার।

অতএব এজন্য আমরা খোদার দরবারে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না, কেননা তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন আর জীবনের বিভিন্ন মোড়ে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয় প্রকৃত ইসলামী শিক্ষানুসারে সেগুলোর সমাধানও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের মাধ্যমে আমাদের অবহিত করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলী, বক্তৃতা এবং বিভিন্ন বৈঠক ও অধিবেশনে কিছু কিছু বিষয় উদাহারণের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন যা তাঁর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)। তিনি তাঁর খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করেছেন যা সচরাচর তিনি স্বয়ং দেখেছেন বা শুনেছেন বা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীরা তাঁকে অবহিত করেছেন। এভাবে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা উপমার মাধ্যমে কোন কথা বোঝা সহজসাধ্য হয়ে যায়। বেশ কিছুকাল থেকে আমি এসব বিষয় ও ঘটনাবলী খুতবায় বর্ণনা করে আসছি। এপ্রেক্ষাপটে আমি বেশ কিছু পত্র পেয়েছি যাতে বলা হয়েছে, এসব ঘটনা বা উদাহারণের মাধ্যমে আমাদের জন্য বিভিন্ন বিষয় বোঝা সহজ হয়ে উঠেছে। যাহোক, আজকের খুতবাও এই প্রেক্ষিতেই প্রদান করা হবে।

হরতাল বা স্ট্রাইক করা বৈধ কিনা —এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে নীতিগতভাবে দেখা উচিত যে, হরতাল বা স্ট্রাইক কেন করা হয়, এর মূল কারণ কি? এর মৌলিক কারণ হলো, ন্যায্য অধিকার প্রদান না করা। জাগতিক বিভিন্ন

ব্যবস্থাপনায় কখনও মালিক শ্রমিকের অধিকার বা প্রাপ্য দেয় না আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকও সুযোগ পেলে মালিকের অধিকার প্রদান করে না এবং এরফলে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি দেখা দেয়। কখনও সরকার নাগরিকদের অধিকার প্রদান করে না আবার কখনও প্রজা সরকারের প্রাপ্য প্রদান করে না। মালিক এবং সরকার যদি অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করে তাহলে স্পষ্টতঃই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্তু শ্রমিক বা প্রজা যদি প্রাপ্য এবং অধিকার প্রদান না করে তখন তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত হয়। অতএব জাগতিক বিষয়াদিতে মানুষ একটি শয়তানী চক্রে পরিবেষ্টিত। তাই ইসলামী শিক্ষা হলো, তোমরা পরস্পর অপরিচিত মানুষের মতো ব্যবহার করো না বরং পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের চেষ্টা কর, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টা কর, তাহলে জাগতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি দেখা দিবে না। এই হলো এ সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামী সংস্কৃতির সার কথা। আর এটি শুধু ইসলামী সরকার ব্যবস্থার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জাগতিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। আর যেখানে অধিকার নেয়ার প্রশ্ন আসে সেখানে স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের পরিবর্তে এবং বেআইনী পন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

যাহোক, এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলামী শাসনের ভিত্তি হলো, ন্যায়বিচার ও ভালোবাসার ওপর। তাই নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যও সেই রীতি অবলম্বন করা উচিত যা ইনসাফ এবং ভালোবাসা ভিত্তিক। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত হরতালে কোন আহমদী অংশ নিলে তিনি (আ.) তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। আজকাল বিভিন্ন ইসলামী বিশ্বে যেসব স্ট্রাইক বা বিদ্রোহ হয় এর পেছনে যেখানে শয়তানী অপশক্তির হাত রয়েছে সেখানে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান না করার কারণেও সচরাচর সরকার এবং জনসাধারণের মাঝে অশান্তি এবং টানাপোড়ন বিরাজ করে। সরকার যদি সুবিচার-ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে তাহলে যেসব শয়তানী অপশক্তি বা বহিরাগত শক্তি রয়েছে, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তারাও কোন সুযোগ পাবে না কেননা; জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তাহলে কেউ, কোন মৌলভী বা কোন নৈরাজ্যবাদী বা কোন দুস্কৃতকারী বা কোন বিদ্রোহী আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর পেছনে চলবে না। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান দেশগুলোকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে অর্থাৎ এসব দেশের শাসকদের তৌফিক দিন তারা যেন জনসাধারণের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারে। সব আহমদীর এ জন্য দোয়া করা উচিত। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন আহমদীকে জোর পূর্বক ধর্মঘটে টেনেও নেয়া হয় তাহলে বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যা সরকারী সম্পত্তির বা সরকারী ধন-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতিতে পর্যবসিত হতে পারে।

একটি সাধারণ নীতি হলো, কোন মানুষ সে যে পেশার সাথেই যুক্ত হোক না কেন, যদি সে নিজের কাজের প্রতি আগ্রহ রাখে তাহলে স্বীয় সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে সে সেই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে উদাহারণ দিয়ে বলেন, কেউ যদি সেনা, শিক্ষক, বিচারক, উকীল, ব্যবসায়ী অথবা সংসদের সেক্রেটারী, স্পিকার বা সরকারের কোন মন্ত্রী হয় বা যেই হোক না কেন, সততার সাথে যে কাজ করে, মন দিয়ে যে কাজ করে এবং পুরো সময় কাজে ব্যায় করে আর সন্ধার সময় যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় বিশ্রাম করে, সে একথাই বলে যে, সারাদিনের কর্মব্যস্ততা এবং কাজের বোঝা আমাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাকাই তখন দেখি যে, তিনি আমাদের জন্য যে আদর্শই রেখে গেছেন তা কেবল তাঁরই বিশেষত্ব। এসব কাজ, যা জীবনের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাথে যুক্ত মানুষ করে থাকে, সেসব কাজ তাদের সবার চেয়ে বেশি তিনি (সা.)-কে করতে দেখা যায়। তিনি (সা.) বিচারকও ছিলেন, শিক্ষকও ছিলেন আবার অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্বাবলীও পালন করতেন কেননা; তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। আইন প্রণয়নও করতেন বা আইনের খুঁটিনাটিও ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু একই সাথে সংসারিক কাজকর্মও করতেন। স্ত্রীদের সাহায্যও করতেন। তিনি কখনও একথা বলেন নি যে, আমি অনেক ব্যস্ত মানুষ, তাই তোমাদের গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করতে পারব না। এ সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখ! মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করতেন আর এত গভীর মনোযোগ সহকারে প্রদান করতেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী'ই মনে করতেন, তাঁর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ রয়েছে আমার প্রতি। আর স্ত্রীও একজন নয় বরং তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন। নয়জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাদের একজনও একথা মনে করতেন না যে, আমার প্রতি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না। মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল আসরের নামাযের পর একবার করে তিনি সব স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাদের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন। অনেক সময় ঘর-গৃহস্থালির কাজেও তিনি তাদের সাহায্য করতেন যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ।এসব কাজ ছাড়াও তাঁর আরও অনেক কাজ ছিল যা তিনি (সা.) করতেন। তাঁর জীবনের কোন একটি মুহূর্তও কর্ম-বিহীন ছিল না। তিনিও সেই দেশে বসবাস করতেন যেই দেশ সম্পর্কে বলা হয়, এটি ম্যালেরিয়া কবলিত দেশ। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশে বসবাসকারী মানুষ কাজ না করার বা আলস্যের কারণ হিসেবে সেই এলাকায় বসবাসকে দায়ী করে এবং বলে, এটি ম্যালেরিয়া কবলিত দেশ। এখানে ম্যালেরিয়া রয়েছে, মানুষ এতে আক্রান্ত হয় আর এ কারণেই তিনি এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত সব কাজের পাশাপাশি আবার পারিবারিক বা সাংসারিক কাজও করতেন। অথচ তিনিও সে অঞ্চলেই বসবাস করতেন যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। আফ্রিকা এবং এশিয়ার মানুষ অজুহাত দেখায় যে, আমাদের আলস্যের কারণ এটি আর কাজ না করার কারণ সেটি। কিন্তু এ কারণগুলো সেখানেও বিদ্যমান ছিল যেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বসবাস করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আমরা দেখেছি; তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাজের অবস্থা যা ছিল তাহলো, আমরা যখন ঘুমাতাম তখনও তাঁকে কাজে রত দেখতাম আর যখন চোখ খুলতো তখনও তাঁকে কাজেই রত পেতাম। এত পরিশ্রম আর এত কষ্ট করা সত্যেও যেসব বন্ধুরা তার বইয়ের প্রুফ পড়ার কাজে অংশ নিত তিনি

তাদের এতটা মূল্যায়ন করতেন যে, এশার সময়ও যদি কেউ ডাকত যে, হুযূর আমি প্রুফ নিয়ে এসেছি, তিনি বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত যেতে গিয়ে রাস্তায় বেশ কয়েকবার বলতেন, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার বড় কষ্ট হয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ্ আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে; অথচ সেই কাজ অর্থাৎ প্রুফ রিডার যে কাজ করতো তা সেই কাজের মোকাবিলায় কিছুই ছিল না যা তিনি (আ.) নিজে করতেন। বস্তুতঃ আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে কাজের এমন অভ্যাস দেখেছি আর এটি দেখে আমরা আশ্চর্য হতাম। অসুস্থতার কারণে অনেক সময় তাঁকে পায়চারি করতে হতো আর সেই অবস্থায়ও তিনি কাজে রত থাকতেন। ভ্রমণের জন্য গেলেও রাস্তায় বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের কথা বলতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন, অথচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চলেই বসবাস করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের আলস্যের জন্য রোগকে দায়ী করা উচিত নয় যা সচরাচর আমরা করে থাকি। তাই যারা অলস আর আলস্যের কারণে আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে তাদের দেহ নয় বরং হৃদয় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। তারা যদি দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমরা পরিশ্রম করব তাহলে নিমিষেই এসব আলস্য দূরীভূত হতে পারে। ম্যালেরিয়া কবলিত অঞ্চল তো একটি অজুহাত মাত্র, যারা সেসব অঞ্চল থেকে এখানে অর্থাৎ ইউরোপে এসে বসতি গেড়েছে তাদের মাঝেও অনেকে এমন আছে যারা ঘরে বসে থাকে, সারাদিন ঘরে বসে হয়তো টেলিভিশন দেখে বা স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে বা ছেলেমেয়েদের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে যে, তারাও ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যায়। অতএব এটি কোন রোগ নয় বরং রোগের অজুহাত মাত্র। এটি কার্যতঃ আলস্য এবং ঔদাসীন্য কেননা; এখানে জীবন-জীবিকার চিন্তা নেই, কোন অজুহাত দেখিয়ে মানুষ বেকার ভাতা তো পেয়েই যায়, তাই কোন কাজ করে না। অতএব এই আলস্য এবং ঔদাসীন্য এখানে বসবাসকারী লোকদেরও পরিহার করতে হবে।

ইসলামে মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার বিভিন্ন রীতি আছে এর একটি হলো মোহরানা যা তার বিয়ের সময় তার জন্য নির্ধারিত হয়। অতএব সেই মোহরানা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। অনেকেই মনে করে, কেবল খোলা বা তালাকের ক্ষেত্রেই মোহরানা দিতে হয়; কিন্তু মোহরানার উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হবে। এটি সেই টাকা যা মহিলার হস্তগত হওয়া চাই যেন প্রয়োজনে বা কোন বিশেষ কারণে যদি তাকে খরচ করতে হয় আর যে খরচের টাকা স্বামীর কাছে চাইতে সে দ্বিধাবোধ করে বা তার লজ্জা হয়। অথবা অনেক সময় এমন প্রয়োজন দেখা দেয় যা যথাসময়ে স্বামীও পূরণ করতে পারে না। মহিলার কাছে কিছু জমা টাকা থাকলে তিনি তার চাহিদা অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খরচ করতে পারেন- এহলো মোহরানার উদ্দেশ্য হলো। যদি হক্ব মোহর না দেয়া হয় তাহলে এই যে দু'টি পরিস্থিতির কথা আমি উল্লেখ করলাম সেগুলো বা অন্য কোন প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না। যেমন কোন মহিলার নিজের প্রয়োজন থাকে, কোন আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করতে হয় আর স্বামীকে তা জানাতে চায় না, তাই তার কাছে এই টাকা গচ্ছিত থাকা উচিত। এমন কিছু টাকা তার কাছে অবশ্যই থাকা উচিত

যা তার তাৎক্ষণিক চাহিদা বা নিজের পছন্দের কোন স্থানে খরচ করতে পারে। অনেক সময় স্বামীর মোহরানা প্রদান তো দূরের কথা, মহিলা নিজে যে আয় করে তার ওপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বলে যে জিজ্ঞেস না করে টাকা খরচ করবে না বা আমাদের তা থেকে দাও, এই পুরো আয়ের এত অংশ আমাদের কাছে আসা উচিত বা আমাদের ব্যাংক একাউন্টে যাওয়া উচিত— এটি সম্পূর্ণরূপে অবৈধ আচরণ। অনুরূপভাবে কিছু দরিদ্র পরিবারে বা কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোর রীতি হলো, বিয়ের সময় মেয়ের স্বামী বা শ্বশুরের কাছ থেকে মেয়ের পিতামাতাই মোহরানা হস্তগত করে নেয় আর মেয়ে কিছুই পায় না। সে বিয়ের পর রিক্তহস্ত থেকে যায়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত রীতি। এটি মেয়েদের বিক্রি করার নামান্তর, যে সম্পর্কে ইসলামে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অনুরূপভাবে অনেক সময় কোন কোন মেয়ে স্বামীদের মোহরানা মাফ করে দেয় কিন্তু এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে। তাদের হাতে টাকা দেওয়ার পর জিজ্ঞেস কর, ক্ষমা করবে কি-না। বরং হযরত ওমর (রা.) এবং কোন কোন ইমাম ও প্রবীণদের সিদ্ধান্ত হলো, মোহরানা মহিলার হাতে তুলে দাও, এরপর এক বছর পর্যন্ত তা সে নিজের কাছে রাখবে, এরপর যদি মহিলা চায় তাহলে স্বামীকে তা ফেরত দিতে পারে। অতএব প্রথমে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত, এরপর যদি সে চায় তাহলে ক্ষমা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মোহরানা মাফ করা সংক্রান্ত এমনই একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবীর সাথে সম্পর্ক রাখে। হাকীম ফযল দ্বীন সাহেব আমাদের জামাতের প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার দু'জন স্ত্রী ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মোহরানা প্রদান করা শরীয়তের নির্দেশ, মহিলাদের তা অবশ্যই দেয়া উচিত। তখন হাকীম সাহেব বলেন যে, আমার স্ত্রীরা মোহরানা মওকুফ করে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আপনি কি তাদের হাতে টাকা রেখে দিয়ে তারপর ক্ষমা করিয়েছিলেন। তিনি বলেন, না হুযূর! আমি এমনিতেই বলেছিলাম আর তারা ছেড়ে দিয়েছে বা মওকুফ করে দিয়েছে। হুযূর বলেন, প্রথমে তাদের ঝুলিতে টাকা রাখুন, এরপর মওকুফ করান। কিন্তু এটিও নিম্নমানের নেকী, সঠিক বিষয় হলো, টাকা অন্ততঃপক্ষে এক বছর মহিলার কাছে থাকা উচিত, এই সময়ের ভেতর যদি সে ক্ষমা করে তাহলে যথার্থ হবে। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন আর মোহরানা ছিল পাঁচশত রুপি করে। হাকীম সাহেব কোন স্থান থেকে ঋণ করে তাদের হাতে পাঁচ শত রুপিকরে তুলে দেন এবং বলেন, তোমাদের স্মরণ থাকবে যে, তোমরা মোহরানা মওকুফ করে দিয়েছ, তাই এখন এই রুপি আমাকে ফেরত দাও। তখন তার স্ত্রীরা বলেন, আমরা তো জানতাম না যে, আপনি আমাদেরকে রুপি দিবেন, তাই আমরা মওকুফ করেছিলাম কিন্তু এখন যখন রুপি আমাদের হাতে এসে গেছে তাই আমরা তা আর ফেরত দিচ্ছি না। হাকীম সাহেব এসে এই ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনান যে, আমি ভেবেছিলাম এই রুপি আমি ফিরে পাব, তাই এক হাজার রুপি ঋণ করে উভয় স্ত্রীকে মোহরানা হিসেবে প্রদান করেছি কিন্তু এখন রুপি নিয়ে তারা তা মাফ করতে অস্বীকার করছে। হুযূর একথা শুনে হাসেন এবং বলেন,

এটিই সঠিক রীতি। প্রথমে মহিলার হাতে মোহরানা রেখে দাও, এর কিছুদিন পর যদি তারা ক্ষমা করতে চায় তাহলে করতে পারে কিন্তু তা না দিয়েই ক্ষমা আদায় করা, এটি অলীক বা ফাঁকা অনুগ্রহ আদায় করারই নামান্তর। কেননা মহিলা জানে, মোহরানা দেয়নি আর দেবেও না, এখন যেহেতু ক্ষমা চাচ্ছে তাই কথা সর্বস্ব অনুগ্রহই করি। অতএব মহিলার হাতে মোহরানার অর্থ আসার পর যদি সে সানন্দে ক্ষমা করে তাহলে ঠিক আছে নতুবা তার মোহরানা যদি দশ লক্ষ রুপিও হয় আর তা তার হাতে না আসে তাহলে সে তা-ও ফেরত দেবে, কেননা সে জানে, নিজের পকেট থেকেতো কিছু দিচ্ছি না, এটি কেবল কথার কথা, তাই একথা বলতে অসুবিধা কি। তাই মওকুফ করাবার পূর্বে মোহরানা তাদের হাতে তুলে দেয়া আবশ্যক। অনেকে ক্ষেত্রে মোহরানা এমন সময়ে দেয়া হয় যখন তারা নিজেদেরই ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অবহিত থাকে না। অনেক সময় মহিলারা জানেন না, কোন স্থানে খরচ করতে হবে বা ব্যয় হবে। অথবা অনেক সময় মেয়ের পিতামাতা নিজেরাই জবরদস্তি ছেলের কাছ থেকে বা তার পিতামাতার কাছ থেকে মোহরানার টাকা হস্তগত করে— এটি অবৈধ। এটি কন্যাকে বিক্রি করার নামান্তর যা কোনভাবেই বৈধ নয়।

এরপর যাকাত রয়েছে। যাকাত প্রদান করা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত। প্রত্যেক ব্যক্তি যার ক্ষেত্রে যাকাতের শর্ত পূরণ হয় তার জন্য যাকাত প্রদান আবশ্যক। কিন্তু কিছু এমন বুযূর্গও রয়েছেন যাদের কাছে যত সম্পদই আসুক, যত আয়ই হোক না কেন তারা তা খোদার পথে ব্যয় করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এমনই এক পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে কতক এমন মানুষও রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কেউ একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, কত টাকার ওপর যাকাত আবশ্যক? তিনি বলেন, তোমার জন্য বিষয় হলো, প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত দাও বা যাকাত প্রদান কর। সেই ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করে, আপনি যে, বললেন তোমার জন্য, এই তোমার জন্য শব্দের অর্থ কি? যাকাতের বিষয় কি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তন হতে থাকে? তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে চল্লিশ রুপি থাকলে তা থেকে এক রুপি যাকাত দেয়া তোমার জন্য আবশ্যক, কিন্তু আমার কাছে যদি চল্লিশ রুপি থাকে তাহলে ৪১ রুপি যাকাত হিসেবে দেয়া আবশ্যক কেননা; তোমার পদমর্যাদা এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি উপার্জন কর এবং খাও কিন্তু আমাকে তিনি এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, আমার ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করেন, এখন যদি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ আমি চল্লিশ টাকা জমা করি তাহলে সেই চল্লিশ টাকাও দিতে হবে আর এক রুপি জরিমানাও দিব। অতএব এই ছিল পুণ্যবানদের অবস্থা।

তাই অনেকের জন্য আবশ্যক হলো, সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রতি মনোযোগী থাকা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার সাধারণ মানুষ জাগতিক আয় উপার্জনও করবেন আর একই সাথে নিজেদের সম্পদ এবং সময়ের কিছু অংশও ব্যয় করবেন এবং ইবাদত ও ধর্মীয় কাজে সময় দিবেন, ইস্তেগফারও করবেন আর দোয়াও করবেন। আল্লাহ্ তা'লা

তাদেরকে যেই সম্মান, সম্পত্তি আর খ্যাতি দিয়েছেন এগুলো খোদার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ, তাই এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হলো তা থেকে অন্যদের জন্য ব্যয় করা ।

কিছু মানুষ ব্যবসায়িক মনমানসিকতা-সম্পন্ন হয়ে থাকে বা কৃত্রিমভাবে অনুকরণ প্রিয়তার বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করে বসে যা জামাতী রীতিনীতির পরিপন্থী বা ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন। ওহদাদারদের মাঝেও এমন মানুষ রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় আঞ্জুমানও এমন সিদ্ধান্ত করে বসে। কাদিয়ানে একবার স্থানীয় জামাত একটি ফরম ছাপায় এবং অন্যদের কাছে এক আনায় তা বিক্রি করতে আরম্ভ করে, (চার পয়সায় এক আনা হয়)। সম্ভবতঃ রিপোর্ট ফরম এর মত কোন ফরম ছিল সেটি। আজও কিছু মানুষ এ ধরনের অভিনবত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আর নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যায়। যাহোক, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাদের যেভাবে বুঝিয়েছিলেন তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন, আমি জামাতের সদস্যদের বলবো, নিজেদের সকল কাজে শরীয়তের শিক্ষা অনুসরণ করুন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুসরণ করুন। সম্প্রতি আমাকে একটি কাগজ দেখানো হয়েছে। আমি শুধু এটি দেখেছি, এই কাগজটি একটি ফরম-এর মত ছিল, তাতে ফরমের মতই ছক আঁকা ছিল কিন্তু যিনি আমাকে তা দেখিয়েছেন তিনি বলেন, এটি এক আনায় বিক্রি হয় আর জানা গেছে, আমাদের স্থানীয় আঞ্জুমান তা আবিষ্কার করেছে। সরকারী টিকেট বা খাম দেখে তারা ভেবেছে যে, আমরাও একটি কাগজ বানিয়ে এর মূল্য নির্ধারণ করব। বলা হয়, কাক হাঁসের চলন ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চলনভঙ্গিও ভুলে গেছে। আমি এখানে একথা বলব না কিন্তু এটি অবশ্যই বলব হাঁস কাকের ভঙ্গী অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের চালটাও ভুলে গেছে। জাগতিক সরকারের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক যে, আমরা তাদের অনুকরণ করব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন কোন ফরম কখনও বানান নি। তাই শত্রুকে অনর্থক এ ধরনের আপত্তির সুযোগ দেয়া কোথাকার বুদ্ধিমত্তা। এমন কথার ফলেই শত্রুরা ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পায় আর বলে, জানা নেই যে, তারা এটি কি করছে। কাজ কোন একজন করে আর দুর্নাম হয় জামাতের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন, স্থানীয় কমিটির অবস্থা তেমনই যেভাবে গুরুদাসপুরে এক বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ বসবাস করতো। দীর্ঘকায় ছিলো, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী এবং আরযি লেখক ছিলো। তার রীতি ছিল যখনই কোন বন্ধুকে দূর থেকে দেখতো আস্সালামুআলাইকুম বলার পরিবর্তে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ধ্বনি উত্তোলন করতো আর কাছে পৌঁছলে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করতো একই সাথে লাফাতে থাকতো। প্রায় সময় সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসতো। তারও আমাদের স্থানীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট-এর মত অনুকরণের অভ্যাস ছিল। হুযূর এখানে অনুকরণের অভ্যাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, অনেকেই অনুকরণ বশতঃ অন্যায় কাজ করে বসে। সেই ব্যক্তি যেহেতু আদালতে আরযি লেখক ছিলো তাই তার ইচ্ছা ছিল আমিও ম্যাজিস্ট্রেট সাজব, আর ফাইল বা রেকর্ড প্রস্তুত করার নির্দেশ দিব। কিন্তু এই বাসনা যেহেতু পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না তাই ঘরে সে একটি রীতি উদ্ভাবন করে। যেমন লবনের একটি ফাইল প্রস্তুত

করে। একইভাবে ঘিয়ের রেকর্ড, মরিচের ফাইল, জ্বালানির ফাইল ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছিল। অফিস থেকে যখন ঘরে আসতো তখন সে একটি ঘড়া উল্টিয়ে এর ওপর বসে পড়তো। স্ত্রী লবনের প্রয়োজনের কথা বললে সে স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলতো, রিডার অমুক ফাইল নিয়ে আস, স্ত্রী ফাইল নিয়ে আসলে সেটি পাঠ করার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করতো এবং বলতো, আচ্ছা এতে একথা রেকর্ড করা হোক যে, আমার নির্দেশে এতটা লবন দেয়া হচ্ছে। একদিন সেই বেচারার দুর্ভাগ্যবশত আদালত থেকে কিছু রেকর্ড বা ফাইল চুরি হয়ে যায়। তদন্ত আরম্ভ হয়। তার এক প্রতিবেশী কর্তৃপক্ষকে বলে, সরকার যদি আমাকে পুরস্কার দেয় তাহলে আমি ফাইলের সংবাদ দিতে পারি। তাকে বলা হয়, ঠিক আছে বল। প্রতিদিন যেহেতু প্রতিবেশীর ঘর থেকে ফাইলের বা রেকর্ডের কথা তার কর্ণগোচর হতো তাই তাৎক্ষণিকভাবে সে সেই বৃদ্ধের কথা উল্লেখ করে। পুলিশ তাদের সকল সাজসরঞ্জামসহ তার ঘরের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হয়। এরপর যখন ফাইল বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে, কোনটি লবনের, কোনটি ঘি-এর আর কোনটি মরিচের ফাইল বা রেকর্ড ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই দৃশ্যই আজ আমরা এখানে দেখি, আমাদের বন্ধুরা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জিনিসকে খুবই উত্তম মনে করে এর অনুকরণ আরম্ভ করে। তারা এটি দেখে না যে, এর প্রয়োজন কি? অতএব এখানে কোন ফরম বা এর মূল্যের প্রশ্ন নয় বরং নীতিগত বিষয় হলো, যা আমাদের শিক্ষা এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী তা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত বা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত। প্রথমতঃ এটি বৈষয়িক কোন অনুকরণ নয় কিন্তু আমাদের যদি কোন ক্ষেত্রে অনুকরণ করতেই হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর অনুকরণ এবং অনুসরণ করা উচিত বা এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমাদের সামনে আদর্শ বানিয়েছেন, তিনি তাঁর মনিবের কাছে যা শিখেছেন এবং আমাদেরকে অবহিত করেছেন, সেই অনুসারে আমাদের জীবন যাপন করা উচিত।

একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-তাঁর নিজস্ব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর বা তাঁর তিরোধানের পর প্রথম খিলাফতের কোন রমযান ছিল। যাহোক, গরমকাল হওয়ার কারণে বা সেহরীর সময় পানি পান করতে না পারার কারণে এক রোযায় আমার প্রচন্ড পিপাসা লাগে, এমনকি আমার বেহুশ বা অচেতন হওয়ার মত আশঙ্কা হয় অথচ সূর্য ডুবতে তখনও এক ঘন্টা বাকী ছিল। আমি শ্রান্ত এবং অবসন্ন হয়ে একটি বিছানায় গা এলিয়ে দেই আর দিব্য দর্শনে দেখি, কেউ আমার মুখে পান পুরে দিয়েছে। আমি সেই পান চোষার পর আমার সব পিপাসা দূর হয়ে যায়। কাশ্ফের এই অবস্থা কেটে যাওয়ার পর আমি দেখি, পিপাসার নাম চিহ্নও আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আমার পিপাসার নিবারণ করেন আর পিপাসা নিবারিত হওয়ার পর পানি পান করার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন তখন ছিল যখন পিপাসা লেগেছিল। আসল উদ্দেশ্য হলো চাহিদা পূরণ করা, তা উপযুক্ত উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমেই হোক বা এর

প্রতি অনিহা বা ভ্রুক্ষেপহীনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই হোক অর্থাৎ এর চাহিদা উবে যাওয়া। হয় প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার মাধ্যমে অথবা সেই জিনিসের চাহিদা দূর করেই হোক।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক একজন লিখেন, দোয়া করুন যেন অমুক মহিলার সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আমরা দোয়া করব কিন্তু বিয়ের কোন শর্ত থাকবে না, বিয়ে হোক বা তার প্রতি ঘৃণাই জন্মাক না কেন। তিনি (আ.) দোয়া করেন। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তি লিখেন, আমার হৃদয়ে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে আমাকেও এক ব্যক্তি এমনটি লিখেছে আর আমিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রীতি অনুসারে তাকে একই উত্তরই দিয়েছি। সে পরবর্তীতে আমাকে অবহিত করে যে, তার হৃদয় থেকে তার ধারণা উবে যেতে থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা দু'ভাবে সাহায্য করেন। অর্থাৎ আসল বিষয় হলো, যেই জিনিসের বাসনা থাকে সেই বাসনা এবং সেই অভীষ্ট অর্জন হওয়া অথবা পাওয়ার যে বাসনা থাকে সেই বাসনাই মন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে এমনটিই দোয়া করা উচিত।প্রকৃত বিষয় হলো, খোদার সন্তুষ্টি এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে দোয়া করা।

এখনও অনেকেই এভাবে পত্র লিখে যে, আমরা অমুক স্থানে সম্পর্ক করতে চাই, দোয়া করুন যেন এটি হয়ে যায়, আর একই সাথে চেষ্টাও করুন, তার পিতা-মাতাকেও বলুন আর সেই জামাতকেও বলুন, নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমিও মরে যাব আর দ্বিতীয় পক্ষও মরে যাবে। এগুলো সব বাজে কথাবার্তা। বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং বংশ বিস্তার। তাই খোদা তা'লার কাছে তাঁর কৃপার ভিক্ষা চাওয়া উচিত, যদি খোদার দৃষ্টিতে শুভ হয় তাহলে যেন এ সম্পর্ক হয়, নতুবা মন থেকে সেই আকর্ষণ হারিয়ে যায়। এই যে জাগতিক ভালোবাসা তা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। জাগতিক ভালোবাসাও খোদার ভালোবাসা বা খোদা প্রেমের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে জাগতিক প্রেম এবং ভালোবাসাও পুণ্যে পর্যবসিত হবে এবং সর্বদা হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে বা প্রশান্তি বয়ে আনবে।

এ পৃথিবীর কোন জিনিস নিজ সত্তায় ক্ষতিকর নয় বা নিজ গুণে ক্ষতিকর নয়, এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'নাক্সভমিকা'ও একপ্রকার বিষ। এটি খেলে অনেকেই মারা যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এর মাধ্যমে আরোগ্যও লাভ করে অর্থাৎ এটি ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে আফিমও অনেক বড় ধ্বংসাত্মক জিনিস কিন্তু এর ধ্বংসের মোকাবিলায় এর উপকারিতা অনেক বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, চিকিৎসকদের প্রশিদ্ধ বচন হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অর্ধেক ঔষধ এমন রয়েছে যাতে আফিম ব্যবহার করা হয়। আর এর উপকারিতা এত বেশি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। মানুষের যখন উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা থাকে, যখন মানুষের ঘুম উড়ে যায়, ব্যথায় অবসন্ন হয়ে যখন মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় তখন তাকে মরফিয়া-র ইনজেকশন দেয়া হয় যার ফলে সে তাৎক্ষণিকভাবে আরাম বোধ করে। অতএব পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যা নিজ সত্তায় ক্ষতিকর। ক্ষতি শুধু ভ্রান্ত ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে যা মানুষেরই ভুল-ভ্রান্তির ফসল। এ

কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) রোগ-বালাইকে নিজের প্রতি আর আরোগ্যকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে একজন মুসলমান আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস রাখার পরও যখন কোন কাজে ব্যর্থ হয় তখন সে বলে বসে, আমি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ব্যর্থ করেছেন, অর্থ্যাৎ সাফল্যের বাহবা সে নিজে নেয় আর ব্যর্থতার জন্য আল্লাহ্ তা'লাকে দায়ী করে।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত বা সত্যিকার মু'মিনের কাজ হলো, কোন কাজের ভালো ফলাফল প্রকাশ পেলে তার আলহামদুলিল্লাহ্ বলা যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সফল করেছেন আর কুফল বা ক্ষতিকর ফলাফল সামনে আসলে তার إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়া উচিত আর বলা উচিত, আমি আমার অপূর্ণতা আর অক্ষমতার কারণে ব্যর্থ হয়েছি। অপূর্ণতাকে যে ব্যক্তি নিজের প্রতি আরোপ করে এবং সাফল্য পেলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে এমন লোকদের প্রতি খোদা তা'লা কৃপা এবং করুণা করেন আর করুণা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার বান্দা সাফল্যকে আমার প্রতি আরোপ করে, তাই আমি তাকে অধিক সাফল্যে ভূষিত করব।

অনেক সামান্য সামান্য কথাও বড় বড় ফলাফল বয়ে আনে, একথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন মহিলার কাহিনী শোনাতেন। তার একটি মাত্র সন্তান ছিল। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে সে তার মাকে বলে যে, এমন কোন জিনিসের নাম বলুন যা আমি ফিরে আসলে আপনার জন্য যেন তোহ্ফা হিসেবে নিয়ে আসতে পারি আর আপনি তা দেখে যেন আনন্দিত হতে পারেন। মা বলেন, তুমি যদি নিরাপদে ফিরে আস তাহলে এটিই আমার জন্য আনন্দের কারণ হবে। ছেলে জোর দেয় যে, আপনি অবশ্যই এমন কোন জিনিসের কথা বলুন। মা তখন বলেন, ঠিক আছে, যদি কিছু আনতেই চাও তাহলে পোড়া রুটির টুকরো যত বেশি পার নিয়ে এস। তা দেখেই আমি আনন্দিত হতে পারি। ছেলে একে খুবই তুচ্ছ বিষয় মনে করে বলে, আরো কিছু বলুন। মা বলেন, এটিই আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করতে পারে। যাহোক, সে চলে যায়। সে যখন রুটি বানাতো তখন ইচ্ছা করে রুটি পুড়ে ফেলত যেন পোড়া রুটির টুকরো বেশি বেশি জমা করা যায়। রুটির কিছু অংশ সে নিজে খেয়ে ফেলত আর পোড়া অংশ একটি থলিতে জমিয়ে রাখতো। কিছুকাল পর ঘরে ফিরে পোড়া রুটির টুকরোর অনেকগুলো থলি সে তার মায়ের সামনে রেখে দেয়। এটি দেখে মা খুবই আনন্দিত হন। সে বলে, মা! আপনার কথার আনুগত্যে আমি এটি করলাম কিন্তু এখনও বুঝতে পারলাম না যে, ব্যাপার কী। মা বলেন, তুমি যখন গিয়েছ তখন এটি বলা যুক্তিযুক্ত ছিল না, তবে এখন বলছি। মানুষের অনেক রোগ আধা-পাকা খাবার খাওয়ার কারণে হয়। তোমাকে পোড়া রুটির টুকরো আনতে বলার কারণ হলো তুমি এই পোড়া টুকরো একত্রিত করার জন্য রুটি ভালভাবে পাকাবে যার ফলে কিছু অংশ পুড়ে যাবে আর তুমি এই জ্বলা অংশ বা পোড়া অংশ রেখে দিবে আর বাকী অংশ খাবে, এর ফলে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আর তাই হয়েছে। এটি বাহ্যতঃ সামান্য একটি কথা। মা যদি ছেলেকে সরাসরি বলতেন, রুটি ভালো করে ভেজে খাবে তাহলে ছেলে বলতে পারত, আমি একজন যুবক, আমি নির্বোধ নই যে কাঁচা রুটি খাব। হুযূর

বলেন, আমি এই যুগেও দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ এই নির্বুদ্ধিতার শিকার আর কাঁচা রুটিই তারা বড় আগ্রহের সাথে খেয়ে যাচ্ছে। যাহোক, মায়ের এই কথা সেই ছেলেকে সুস্থ রাখার কারণ হয়েছে।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার এই অবতরণিকার উদ্দেশ্য হলো, (আসলে খুতবায় তিনি একটি বিষয় বর্ণনা করছিলেন) দোয়া গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই মনে করে, ছোট ছোট কথা বলা হয় অথচ এসব কথা পূর্ব থেকেই আমাদের জানা আছে। হুযূর বলেন, জানা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা মেনে চলে না। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দু'টো মৌলিক শর্ত রয়েছে যা স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي " (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) অর্থাৎ আমার কথা মানো এবং আমার ওপর ঈমান আনো। এ ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেমন: দরুদ পড়, সদকা দাও, কিন্তু পবিত্র কুরআন এই দু'টি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ । মানুষ বলে, আমরা জানি। জানা আছে ঠিকই কিন্তু এর ওপর তাদের আমল নেই। অনেকে আমাকে একথাও লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি। এটি খোদার ওপর অপবাদ আরোপ করার নামান্তর। সত্যিকার অর্থে এটি ঈমানের দুর্বলতাও বটে। কিছুকাল পূর্বে একজন আমার কাছে আসে আর বলে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু তা গৃহীত হয়নি, এর কারণ কি? আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, " فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي " অর্থাৎ আমার নির্দেশ মেনে চল, তুমি কি খোদার সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চল? সে বলে, না। অতএব আমাদেরকে প্রথমে নিজেদের অবস্থা যাচাই করতে হবে যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার কথা মেনে চলছি। এছাড়া "يُؤْمِنُوا بِي "-র ওপরও মানুষ প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু বাহ্যতঃ দোয়া কবুল হয়নি তাই আমরা মনে করি দোয়া গৃহীত হয়নি, আর তাই ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। অতএব হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত ঈমান থাকা উচিত, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, দুর্বলতা নিজের প্রতি আরোপ করুন আর সাফল্য খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করুন। এমনটি হলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে আশা রাখে যে, আমি তার দোয়া গ্রহণ করব। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ এবং কবুল করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দিন, আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, আর আমাদের দোয়াকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন।

নামাযের পর এক ভাই-এর গায়েবানা জানাযা পড়াব। গ্লাসগোর সৈয়দ আসাদুল ইসলাম শাহ্ সাহেবের জানাযা এটি, যিনি সৈয়দ নঈম শাহ্ সাহেবের পুত্র। তার দাদা এবং এই পরিবার জামাতের বড়ই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ সেবক একটি পরিবার। ২০১৬ সনের ২৪শে মার্চ ৪০ বছর বয়সে এক দুষ্কৃতকারীর হামলায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ২৪শে মার্চ তারিখে গ্লাসগোতে তাকে তার দোকানের বাইরে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে তাকে হাসপাতাল নেয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। আহমদী হওয়ার কারণে তাকে শহীদ করা হয়েছে এবং তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আর শাহাদাতের মর্যাদা পেয়েছেন। প্রচার মাধ্যম এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান তার প্রতি গভীর

সহানুভূতি জানিয়েছে। সরকারের কাজ হলো, এসব কট্টরপন্থী বা উগ্রপন্থীদের প্রতিহত করা। নতুবা এখানেও যদি মৌলভীদের লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা এদেশেও সেসব নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে যা অন্যান্য মুসলমান দেশে এরা সৃষ্টি করে রেখেছে। মরহুম ১৯৭৪ সনের ফেব্রুয়ারিতে রাবওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নুসরত জাঁহা একাডেমি থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে ১৯৯৮ সনে গ্লাসগো চলে আসেন এবং তার পিতার সাথে ব্যবসায় যোগ দেন। তিনি ওসীয়্যতও করেছেন, রীতিমত চাঁদাও দিতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিপোর্ট অনুসারে রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়ার কার্যক্রমে অংশ নিতেন, ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করতেন, চাঁদাও দিতেন, রীতিমত জুমুআর নামাযে আসতেন। অধিকাংশ ইজতেমায় তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। মরহুম আসাদ শাহ্ সাহেব সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের পেনশনার ডাক্তার নাসিরুদ্দীন কৃমর সাহেবের জামাতা ছিলেন। কিছুকাল যাবৎ মাঝে মাঝে তিনি মনস্তাত্ত্বিক রোগের শিকার চলে আসছেন। যাহোক রিজিওনাল আমীর সাহেব জানিয়েছেন, তার সাথে যখন আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তিনি খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। অনেকের এই ভুল ধারণা রয়েছে যে, তিনি হয়তো জামাত ছেড়ে দিয়েছেন, একথা সঠিক নয়। তিনি আহমদী ছিলেন এবং আহমদীয়াতের কারণেই শাহাদত বরণ করেন আর শেষ পর্যন্ত রীতিমত খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং জামাতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন।

কাবাবীরের মুরুব্বী শামসুদ্দিন সাহেব লিখেন, আসাদ সাহেব-এর স্ত্রী তৈয়্যবা সাহেবার সম্পর্ক কাদিয়ানের সাথে। শামসুদ্দিন সাহেবের স্ত্রীর চাচাত বোন তিনি। ইনি বলছেন, কয়েক বছর পূর্বে এই অধম দু'বার তার ঘরে যাওয়ার সুযোগ পায়। এক রাতে সেখানে অবস্থানেরও সুযোগ হয়। উভয়বার এই অধমের কাছে জামাতী এবং তবলীগি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। কোন জাগতিক কথাবার্তা হয় নি। উভয় রাতে আমি তাকে তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি মাগফিরাত করুন আর তার নিকটাত্মীয়, তার পিতা-মাতা এবং স্ত্রীকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। নামাযের পর যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।